

আলিয়া ইজেতবেগভিচ ও বসনিয়া

নূরুল হুদা হাবীব



গার্ডিয়ান

পা ব লি কে শ ন স

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

◇ সার্বিয়া থেকে বসনিয়ায় আলিয়ার পূর্বপুরুষ	১৭
◇ আলিয়ার পরিবার	১৮
◇ আলিয়ার জন্ম	১৯
◇ সারায়েভোতে আলিয়ার পরিবার	২০
◇ আলিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা	২০
◇ আলিয়ার বেড়ে ওঠার দিনগুলো	২১
◇ হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিয়া	২৩
◇ কমিউনিস্ট প্রচারণা ও আলিয়া	২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় সংগ্রাম, কারাভোগ ও বিয়ে

◇ ‘ইয়াং মুসলিম’ গঠন ও আলিয়া	২৮
◇ সেনাবাহিনীতে যোগ না দিয়ে পলাতক আলিয়া	৩২
◇ যুগোস্লাভিয়া গঠন	৩৩
◇ আলিয়ার প্রথম কারাবরণ	৩৪
◇ কারাগারের স্মৃতিময় দিনগুলো	৩৮
◇ আলিয়া ইজেতবেগভিচের বিয়ে	৪০
◇ আলিয়ার চাকরি	৪১

তৃতীয় অধ্যায় যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন, বসনিয়ার স্বাধীনতা ও সারায়েভো ট্রায়াল

◇ টিটোর শাসনামলে যুগোস্লাভিয়ার মুসলিম	৪৩
◇ বসনিয় মুসলিমদের পুনর্জাগরণ	৪৫
◇ বসনিয়ার ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	৪৭
◇ দ্বিতীয়বার গ্রেফতার আলিয়া	৫১
◇ ইসলামিক ডিক্লারেশন ও সারায়েভো ট্রায়াল	৫৪
◇ রায় ঘোষণা	৬০
◇ কারাগারে আলিয়া	৬৪

◇ টিটোর মৃত্যু ও যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন	৭০
◇ আলিয়া ইজেতবেগভিচ কর্তৃক রাজনৈতিক দল গঠন	৭৪
◇ নির্বাচনে জয়লাভ	৮৩
◇ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আলিয়া	৮৫
◇ বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা	৮৭

চতুর্থ অধ্যায় যুদ্ধের বিভীষিকা ও আলিয়া ইজেতবেগভিচ

◇ যুদ্ধের শুরু যেভাবে	৯৩
◇ বসনিয়দের জাতিগত পরিচিতি ও যুদ্ধের কারণ	৯৬
◇ কন্যা সাবিনাসহ সার্ব সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ আলিয়া	১০১
◇ বিমানবন্দর থেকে লুকাভিচা সেনাঘাঁটিতে	১০৪
◇ বসনিয় মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতি	১০৬
◇ জাতিসংঘ কর্তৃক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা	১০৮
◇ ওআইসির বিশেষ সম্মেলনে আলিয়া	১১০
◇ অকথ্য নির্যাতন ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ	১১৩
◇ ধর্ষণের বীভৎসতা	১১৭
◇ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশু	১২৪
◇ শুধু নারী নয়; পুরুষ ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন	১২৬
◇ যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও ঘটনাপ্রবাহ	১২৭
◇ স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা	১২৯
◇ বসনিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুঃসাহসিক ভূমিকা	১৩৪

পঞ্চম অধ্যায় অবশেষে শান্তি

◇ ভ্যান্স-ওয়েন পিস প্ল্যান	১৪০
◇ ডেটন শান্তিচুক্তি ও বসনিয়া সংকটের সমাধান	১৪২
◇ ডেটন চুক্তি কী প্রকৃতপক্ষে শান্তিচুক্তি	১৪৭
◇ বসনিয়া সংকট ও মুসলিম বিশ্ব	১৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায় বসনিয়া সংকটে কতিপয় আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকা

◇ সিনেটে প্রতিবাদমুখর জো বাইডেন	১৫১
◇ বিল ক্লিনটন	১৫৫
◇ নাজমুদ্দিন এরবাকান	১৫৬

◈ মাহাথির মুহাম্মাদ	১৫৭
◈ ইয়াসির আরাফাত	১৬০
◈ মুহাম্মাদ আলি ক্রে	১৬১
◈ বেনজির ভুট্টো	১৬৪
◈ আয়িশা গাদ্দাফি	১৬৪

সপ্তম অধ্যায় যুদ্ধপরবর্তী আলিয়া ও তাঁর শেষ জীবন

◈ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আলিয়ার অবসর গ্রহণ	১৬৫
◈ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিয়ার ঐতিহাসিক ভাষণ	১৬৬
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের মৃত্যুশয্যায় এরদোয়ান	১৭৫
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের ইন্তেকাল	১৭৭
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের জানাজা	১৮০
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের সন্তানাদি	১৮৩
◈ লায়লা আকশামিয়া	১৮৩
◈ সাবিনা বেরবেরোভিচ	১৮৪
◈ বাকির ইজেতবেগভিচ	১৮৪
◈ সন্তানদের চোখে আলিয়া	১৮৫
◈ আলিয়ার পুরস্কার ও সম্মাননা	১৮৬
◈ সৌদি আরব কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি	১৮৬
◈ তুরস্ক কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি	১৮৭

অষ্টম অধ্যায় আলিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সত্তা

◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা	১৮৮
◈ আলিয়ার রাষ্ট্রচিন্তা	২০৭
◈ আলিয়ার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি	২০৯
◈ আলিয়ার রাজনৈতিক সত্তা	২১০

নবম অধ্যায় বসনিয়া-হার্জেগোভিনার পরিচিতি

◈ বসনিয়ার ইতিহাসের পরিক্রমা	২১৬
◈ নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান	২১৮
◈ ভাষা	২১৯
◈ জনসংখ্যা	২১৯

◈ প্রাচীনকালে বসনিয়া	২২০
◈ মধ্যযুগে বসনিয়া	২২২
◈ বসনিয়ায় অটোম্যানদের আগমন	২২৩
◈ অটোম্যান আমলে বসনিয়া	২২৬
◈ অটোম্যান পরবর্তী বসনিয়া	২৩০
◈ ফিলিস্তিনে বসনিয় মুসলিম কমিউনিটি	২৩২
◈ প্রশাসনিক কাঠামো	২৩৩
◈ বসনিয়ার রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল	২৩৪
◈ শিক্ষাব্যবস্থা	২৩৭
◈ অর্থনীতি	২৩৯
◈ সংস্কৃতি	২৪১
◈ কতিপয় বসনিয় প্রবাদ-প্রবচন	২৪৭
◈ বসনিয়ার ইসলামিক কমিউনিটির পরিচিতি	২৪৭
◈ যুদ্ধের পূর্বাপর বসনিয়া	২৫০
◈ মুসলিম বিশ্ব ও বসনিয়া	২৫১
◈ বসনিয়ায় অন্যান্য মতবাদের প্রভাব ও তাদের কার্যক্রম	২৫৩

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

সার্বিয়া থেকে বসনিয়ায় আলিয়ার পূর্বপুরুষ

অটোম্যান সাম্রাজ্যের তখন পড়ন্ত বিকেল।

কয়েক শ বছরব্যাপী দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে দুনিয়ার তিন তিনটি মহাদেশ শাসনকারী অটোম্যান শৌর্য-বীর্য হারিয়ে তখন ক্রমান্বয়ে সূর্যাস্তের পথে। অটোম্যানদের এ অনিবার্য পরিণতির অংশ হিসেবে ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির মাধ্যমে তাদের বসনিয়ার কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কাছে। নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় হচ্ছে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি অঞ্চলের রাজবংশের সম্মিলিত একটি সাম্রাজ্য। কয়েক শ বছর ধরে এ অঞ্চলকে শাসন করার পর বসনিয়ার কর্তৃত্ব হাতছাড়া হওয়াটা অটোম্যানদের জন্য ছিল অবমাননাকর। কিন্তু ততদিনে আর তেমন কিছুই করার ছিল না। সার্বিয়ায় অটোম্যানদের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার পর সার্বিয়ার মুসলিমদের সেখান থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। ফলে অসংখ্য মুসলিম পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আশেপাশের অঞ্চলসমূহে পাড়ি জমায়। শুধু সার্বিয়া নয়, অটোম্যান শাসিত বলকান অঞ্চলের মুসলিমদের জন্যই এটি ছিল একটি স্বাভাবিক পরিণতি।

এই হিজরতকারী পরিবারগুলোর মধ্যে একটি ছিল ইজেতবেগভিচ পরিবার। পরিবারটি সে সময় সার্বিয়ার বেলগ্রেড থেকে বসনিয়ার বোসান্সকি শামাচ নামক এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। বসনিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসনিয়ার সবচেয়ে বড়ো দুটো নদী সাভা ও বোসনা নদীঘেরা সদ্যজাত শিশুর মতো সদ্য গঠিত সামাচ শহরটি তখনও ততটা উন্নত-পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেনি। অটোম্যান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল আজিজ অটোম্যানদের আরেক প্রদেশ Smerdrevo থেকে আগত মুসলিমদের আশ্রয়ের জন্য ছোট্ট এই ভূখণ্ডটি বরাদ্দ করেছিলেন। আগত মুসলিমরাই মূলত ১৮৬২ সালে শহরটির গোড়াপত্তন করেন। ১৯০৮ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগপর্যন্ত এটি অটোম্যান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ইজেতবেগভিচ পরিবার শহরটিতে কয়েক দশক বসবাস করে। সামাচে আসার কিছুদিন পর আলিয়া ইজেতবেগভিচের দাদা শামাচের মেয়র নির্বাচিত হন।

আলিয়ার পরিবার

অটোম্যান আমলে পরিবারটির ছিল বংশপরম্পরায় বিরাট ব্যাবসা ও বিপুল অর্থসম্পদ। সেইসাথে বংশগতভাবেই পরিবারে ছিল সৈনিকের ধারা। আলিয়ার দাদার নামও ছিল আলিয়া ইজেতবেগভিচ। দাদা আলিয়া ইস্তাম্বুলে অটোম্যান সেনাবাহিনীর অসম সাহসী লড়াকু সৈনিক

ছিলেন। ইস্তাম্বুলে থাকাবস্থায় ইস্তাম্বুলের উস্কুদার অঞ্চলের ‘সাদিকা’ নামের এক সম্ভ্রান্ত বংশের তুর্কি রমণীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আলিয়ার দাদা। সেদিক থেকে আলিয়ার শরীরে বইছিল তুর্কি রক্তের ধারা। দাদার মতো বাবা মুস্তাফা ইজেতবেগভিচও ছিলেন সাহসী সৈনিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পক্ষে লড়াইয়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। এত বেশি আহত হয়েছিলেন যে, শরীরের একাংশ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল। নিজের কাজগুলোও নিজে করতে পারতেন না। মৃত্যু অবধি জীবনের শেষ দশ বছর তাকে প্রায় বিছানায় কাটাতে হয়েছিল। আলিয়ার মা হিবা ইজেতবেগভিচ অত্যন্ত বিদুষী মহিলা ছিলেন। সন্তানদের দেখাশোনার পাশাপাশি বিছানাগত স্বামীকে দেখভাল করতে হতো। তিনি ছিলেন ধৈর্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। অসুস্থ স্বামীর দেখভাল, সন্তানাদি পালন ও সংসারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এক হাতে করতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হতেন না। মাঝে মাঝে আলিয়া ও তার বোনেরা বাবাকে ছোটোখাটো কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করত। ১৯২১ সালে আলিয়ার বাবার প্রথম স্ত্রী মারা যান। তারপর তিনি আলিয়ার মাকে বিবাহ করেন। আলিয়ার মায়ের গর্ভের পাঁচ ভাই-বোন আর সৎ-মায়ের গর্ভের দুই ভাই মিলে বেশ বড়োসড়ো একটি পরিবার ছিল তাদের।



পরিবারের সাথে শিশু আলিয়া

আলিয়ার জন্ম

আলিয়ার পরিবার শামাচে আসার কয়েক বছর পরেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কয়েক বছর পর সার্বিয়া থেকে হিজরতকারী এই পরিবারেই পর পর দুই মেয়ের জন্মের পর ১৯২৫ সালের ৮ আগস্ট, শনিবার মুস্তাফা ইজেতবেগভিচ ও হিবা ইজেতবেগভিচ দম্পত্তির কোল আলোকিত করে ভূমিষ্ঠ হয় এক ফুটফুটে পুত্র সন্তান। এই সন্তানটি আর কেউ নয়, তিনিই হলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, দার্শনিক, বসনিয়ার স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা ও দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট, জ্ঞানসম্মানিত আলিয়া ইজেতবেগভিচ। দৈহিক আকৃতির দিক থেকে আলিয়া দেখতে ছিলেন তার মা আর মামাদের মতো, কিন্তু আচার-আচরণ ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন বাবার মতো। অসম সাহসী বাবা আর দাদার সাহস ও দৃঢ়তা ছিল তার পারিবারিক

উত্তরাধিকার। কিন্তু আলিয়া আক্ষেপ করতেন, তিনি যদি বাবার মতো হতেন! তার বাবা মুস্তাফা ছিলেন সুদর্শন ও সৈনিকসুলভ শারীরিক গঠনের এক নয়ন জুড়ানো সুপুরুষ।

সারায়েভোতে আলিয়ার পরিবার

১৯২৮ সাল। আলিয়ার বয়স তখন তিন বছরও পূর্ণ হয়নি। নিজের অসুস্থতা, ব্যবসায় মন্দা, অর্থনৈতিক অনটন সব মিলিয়ে সংসার খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না দেখে মুস্তাফা ইজ্জতবেগভিচ সপরিবারে রাজধানী সারায়েভোতে চলে গেলেন। পরিবারের সকলের হাসি-আনন্দের উৎস আলিয়া। বড়ো বোন দুজন আলিয়াকে নিয়ে খেলে, আদর করে। সারায়েভোর আলো-বাতাসে গুটিগুটি পায়ে এভাবেই বেড়ে উঠতে থাকে আলিয়া।

যদিও আলিয়ার বাবা তার মামা তথা মায়ের পক্ষের আত্মীয়দের সহায়তায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকতেন, তথাপি তাকে সকলেই শ্রদ্ধা ও সমীহ করত। আলিয়ার মামাদের পরিবারের বিয়েশাদি-সংক্রান্ত বা পারিবারিক ছোটোখাটো ঝামেলাগুলো তার বাবাই সমাধান করতেন। বলা যায় আলিয়ার মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়স্বজন আলিয়ার বাবাকে একপ্রকার অভিভাবক ও বিচারক হিসেবেও মানত। শিশু আলিয়া মাকে একটু বেশিই ভালোবাসত। আলিয়া তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—‘মা যখন বাবার সাথে বাইরে কোথাও ঘুরতে যেত, বাসায় না ফেরা পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারতাম না। কখনো কখনো মায়ের ফিরতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে যেত। তবুও মধ্যরাত অবধি আমি মায়ের ফেরার অপেক্ষায় থাকতাম—কখন মায়ের পায়ের শব্দ শুনব। মা-বাবার দরজা খোলার শব্দ শুনে তাদের দেখে তবেই ঘুমাতাম।’^১

আলিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা

হাটি হাটি পা পা করে আলিয়ার বয়স যখন সাড়ে পাঁচ বছর, তার মা সিদ্ধান্ত নিলেন মক্তবে ভর্তি করবেন। বসনিয়ার মক্তবগুলো অটোম্যান আমল থেকে চলে আসা ইসলামি শিক্ষার দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরম্পরার অংশ। ভোরবেলায় স্থানীয় মসজিদে বাচ্চাদের কুরআন শেখার জন্য মক্তবের এ ধারা আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যদিও সেগুলো এখন ক্রমহ্রাসমান! বসনিয় ভাষায় মক্তবকে বলা হয় মেকতেব (Mekteb)। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মা হিবা আলিয়াকে মক্তবে ভর্তি করালেন। ছয় মাস যেতে না যেতেই শিশু আলিয়া কুরআন পড়া শিখে ফেলল। তাই দেখে বাবা মুস্তাফার আনন্দ যেন আর ধরে না! বন্ধুদের কাছে গর্ব করে বলেন—‘জানো, আমার ছেলে কুরআন পড়া শিখে ফেলেছে!’ আলিয়া কুরআন পড়া শিখেছে জেনে তার বাবার এক বন্ধু আলিয়ার জন্য ছোট্ট একটি কাঠের ডেস্ক বানিয়ে দেন। যেন বন্ধুপুত্র আলিয়া এর ওপর বই রেখে পড়তে, লিখতে ও বাড়ির কাজ করতে পারে। পরিবার ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার আগপর্যন্ত আলিয়া তার বাবার বন্ধুর দেওয়া ওই ডেস্কেই পড়াশোনা করতেন। সাড়ে ছয় বছর বয়সে শিশু আলিয়া মক্তবের নির্ধারিত পাঠ শেষ করলে মা তাকে প্রাথমিক

^১ Alija Izetbegović, Inescapable Questions: Autobiographical Notes, translated by Saba Rissaluddin and Jasmina Izetbegovic (Leicester: The Islamic Foundation, 2003) P. 13

বিদ্যালয়ে (Elementary School) ভর্তি করে দিলেন। আলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন, তারা অধিকাংশই ছিলেন সার্ব। অল্প সময়ের জন্য মুহিচ নামের কেবল একজন মুসলিম শিক্ষককে পেয়েছিলেন। আলিয়ার বয়স তখন নয় বছর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ গ্রেডে (শ্রেণি) পড়েন। হঠাৎ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের শাসক কিং আলেক্সান্ডার আততায়ীদের হাতে নিহত হয়। গোটা সাম্রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিটি বাড়িতে কালো পতাকা টাঙানো হয়। আলিয়াদের বাড়িও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আলিয়া বলেছেন— ‘প্রায় ছয় মাস যাবৎ শহরজুড়ে এত কালো পতাকা টাঙিয়ে রাখা হয় যে, গোটা শহরকে মনে হতো যেন একটি কাক।’

আলিয়ার বেড়ে ওঠার দিনগুলো

ওইটুকু বয়সে অত সকলাবেলায় ঘুম থেকে উঠতে কার মন চায়! আলিয়ারও উঠতে মন চাইত না। তবুও মা তাকে ভোরবেলায় ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। খুব ভোরে মা আগে ওঠে আলিয়াকে জাগিয়ে ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে পাঠাতেন। বর্তমানের বসনীয় সমাজ স্বচক্ষে দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় শাসনের ওই কঠিন সময়ে একজন বালককে ঘুম থেকে জাগিয়ে মসজিদে পাঠানো কতটা ধর্মভীরুতার পরিচায়ক। কতটা পরহেজগার হলে তখনকার বৈরী সমাজেও সন্তানকে ইসলাম চর্চায় অভ্যস্ত করতে ফজরে মসজিদে পাঠানো যায়। ফজরের নামাজকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ‘সাবাহ’। সাবাহ শব্দটি মূলত আরবি, এর বাংলা অর্থ ভোর, সকাল, প্রত্যুষ। ফজরের নামাজ ভোরবেলায় পড়া হয় বলে একে সাবাহ বলে। আলিয়াদের বাসা তখন সারায়েভো শহরের প্রাণকেন্দ্রে টাউন হলের বিপরীতে হাজিসকা মসজিদের পাশে। সারায়েভো শহরের বুক চিরে কুল কুল রবে সাপের মতো আঁকাবাঁকা হয়ে বয়ে যাওয়া খালের মতো সরু নদীর পাড়ে মসজিদটি অবস্থিত। এই হাজিসকা মসজিদেই নিয়মিত ফজর পড়তেন আলিয়া।



লেখকের ক্যামেরায় হাজিসকা মসজিদ

মসজিদের ইমাম ছিলেন মুয়েজিনোভিচ নামের এক বয়স্ক ব্যক্তি। স্থানীয় সকলের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ইমাম মুয়েজিনোভিচ। ইমাম সাহেব ফজরের নামাজে সাধারণত সূরা আর-রহমানের দ্বিতীয় রুকু তিলাওয়াত করতেন। মসজিদের চারদিকে ফুটন্ত ফুলের মনমাতানো সৌরভে, ইমামের সুমধুর কণ্ঠে কাব্যময় সূরা আর-রহমানের অনুপম তিলাওয়াতে, বসন্তের প্রত্যুষের মৃদু সমীরণে বালক আলিয়া এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতা খুঁজে পেত। এক অন্যরকম ভালো লাগার পরশ ছুঁয়ে যেত তার কচি হৃদয়ে; যেটি তিনি জীবনের শেষ অবধি অনুভব করেছেন।

আলিয়ার মা তার বাবার পরিবার থেকে সম্পত্তির একটা অংশ পেয়েছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে আলিয়ার পরিবার বসনিয়ার আজিচি শহরে বেড়াতে যেত। শহরটি রাজধানী সারায়েভো থেকে খুব একটা দূরে নয়। ১৯৩২ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যবর্তী এই ৭-৮ বছরে প্রতিবছরই গ্রীষ্মের স্কুল ছুটিতে গ্রামের সে বাড়িতে যেত। আলিয়ার বাবা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ার আগপর্যন্ত বাবা-মাসহ সবাইকে নিয়েই যেত। বাবা অসুস্থ হওয়ার পর বিধবা খালার সাথে আলিয়ারা সব ভাই-বোন মিলে আজিচি যেত। বাল্যকালের সে সোনার দিনগুলো আলিয়ার জীবনের নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় সময়।

হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিয়া

প্রাইমারি স্কুল শেষ হলে আলিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। আলিয়ার স্কুলের নাম ছিল ‘ফার্স্ট বয়েজ জিমনেসিয়াম স্কুল’। স্কুলটি সারায়েভো শহরের নামকরা স্কুলগুলোর একটি। এখান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা সেরা ছাত্র বলে বিবেচিত হতো। না, এটি শরীরচর্চার জিমনেসিয়াম নয়; বরং স্কুলের পঠন-পাঠন পদ্ধতির একটি বিশেষ অ্যাকাডেমিক ধারা। এখানে সাধারণত কয়েক বছর পড়তে হয়, এক একটি বছরকে এক একটি গ্রেড বলা হয়। খুব ভালোও নয় আবার খারাপও নয়; বরং আলিয়া ছিলেন মধ্যম মানের শিক্ষার্থী। খুব মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে তারপর বইপত্র দূরে সরিয়ে রাখতেন তিনি। একবার তাকে জিমনেসিয়াম স্কুলের চতুর্থ গ্রেডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়নি আগের গ্রেডে ইতিহাস বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ার কারণে; যদিও ইতিহাস তার পছন্দের বিষয় ছিল। আলিয়া তার ভাষায় বলেছেন—‘আমি ইতিহাসে কম নম্বর পাওয়ার জন্য ইতিহাসের শিক্ষককেই দায়ী করলাম। তিনি ছিলেন সার্বিয়া থেকে আসা সার্ব, দৈহিকভাবে বেশ লম্বা গড়নের। পূর্বাঞ্চলীয় কথ্যভাষায় কথা বলতেন, মাঝে মাঝে মুসলিম ছাত্রদের ঠাট্টা করতেন। আমার মনে হয়েছে কম নম্বর পাওয়ার জন্য তাকে দায়ী করাটা আমার যথোপযুক্ত ছিল।’

১৮-১৯ বছর বয়সেই আলিয়া ইউরোপীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি পড়ে ফেলেন। যে বয়সে অনেকে দর্শন কি সেটিই জানে না, সেখানে সে বয়সে আলিয়া দর্শনের নামকরা বইগুলো পড়েছেন। ব্রাগসনের *Creative Evolution*, কান্টের *Critique of Pure Reason* এবং স্পেংলারের *Decline of the West* বইগুলো তার মননশীলতায় গভীর রেখাপাত করে। প্রথমদিকে তিনি যদিও হেগেলের অনুরাগী ছিলেন না, পরে অবশ্য তিনি হেগেলের লেখাও পড়েছেন। আলিয়া যখন তার হাইস্কুলের পড়াশোনার শেষের দিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন

মাকামাঝি পর্যায়ে। খাদ্যসামগ্রীর স্বাভাবিক বাজারজাতকরণ ব্যাহত হওয়ায় ঠিকমতো বাজার করা যেত না। ফলে খাদ্যাভাবে মাঝে মাঝে না খেয়েও থাকতে হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম ডামাডোলের মধ্যে আলিয়া ১৯৪৩ সালে হাইস্কুলের পর্ব শেষ করেন। হাইস্কুল শেষ করার পর হাইস্কুলের সার্টিফিকেট দিয়ে ভাগ্যক্রমে একটি চাকরি পেয়ে গেলেন। কিশোর বেলায় চাকরিটি তার জন্য ছিল আশীর্বাদস্বরূপ।



কিশোর আলিয়া ইজতেবেগভিচ

এরই মধ্যে তিনি গ্রোফতার হলেন এবং তিন বছর কারাভোগ করলেন। ছোটবেলা থেকেই আলিয়ার পছন্দের বিষয় ছিল আইন। স্বপ্ন দেখতেন আইনজীবী হওয়ার। দীর্ঘ কারাভোগ শেষে ১৯৪৯ সালে যখন তিনি মুক্ত হলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন আইন পড়বেন। আলিয়ার মামা মিস্টার শুকরিয়া তখন নামকরা আইনজীবী। তিনি আলিয়াকে আইনে ভর্তি হতে নিরুৎসাহিত করলেন। আলিয়ার বাবাও বললেন—‘দেখো, একজন কারাভোগ করা ব্যক্তি হিসেবে তুমি আইন পেশায় ভালো করতে পারবে না। কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ এখনও ভুলে যায়নি যে, তুমি কারাভোগ করেছ, তারা তোমাকে ক্ষমাও করেনি এখনও।’ কৃষিবিজ্ঞানে ভর্তি হলেন আলিয়া। তিন বছরে ১৩টি কোর্স সফলভাবে পাশও করলেন। কৃষিবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণ শিক্ষার্থী ছিলেন। যত বছর গড়ায়, সেমিস্টার পার হয়; তিনি কৃষিশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারাতে থাকেন। স্বপ্ন যার আইন পড়ে বড়ো আইনজীবী হওয়া, কৃষিশিক্ষা তার কী করে ভালো লাগবে? অবশেষে তিনি কৃষিবিদ্যা থেকে বলকানের অন্যতম নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজধানীতে অবস্থিত ‘ইউনিভার্সিটি অব সারায়েভো’-

তে ১৯৫৪ সালে স্বপ্নের আইন অনুযায়ী বদলি হলেন। এবারের বিষয় তার মনঃপূত হলো, মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। বিগত তিন বছরের পড়াশোনার ব্যাপারে আলিয়া বলেছেন—‘আমার মনে হয়নি তিন বছর কৃষিবিদ্যা পড়া আমার বিফলে গেছে; বরং আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পেরেছি। যেমন : গণিত, ভূমিবিদ্যা এবং চার প্রকারের রসায়ন তথা Organic, Inorganic, Analytical এবং Agricultural Chemistry পড়েছি।’ দুই বছরের মাথায় ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে আইনবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে আলিয়া তার দীর্ঘ লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন।

কমিউনিস্ট প্রচারণা ও আলিয়া

আলিয়া তখন ১৫ বছরের কিশোর। বাবা-মায়ের কঠোর শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে তখন তিনি অনেকটাই মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিজের মতো করে জীবন পরিচালনা করেন। সহপাঠী বন্ধুদের সাথে জীবন-জগতের চারপাশের সমস্ত চিন্তা ভাগাভাগি করেন। ছোটবেলা থেকেই পড়ুয়া ছিলেন তিনি। বন্ধুদের সাথে সমাজতান্ত্রিক ও নাস্তিক লেখকদের বইপত্রও পড়েন। যুগোস্লাভিয়ায় তখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় শাসন, কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কমিউনিজমের চর্চা হয় বিপুলভাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে হাইস্কুলে পড়তেন, সেখানকার শিক্ষকদের মধ্যে কমিউনিজমের চর্চা ছিল প্রবল। এমনকি আশেপাশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় তার স্কুলেই সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। শিক্ষকরা নানাভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমিউনিজমের নাস্তিক্যবাদী আদর্শের বীজ বুনে দেওয়ার চেষ্টা করত। তদুপরি পোস্টার, হ্যান্ডবিল, লিফলেট হাতে হাতে বিতরণের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের চেষ্টা করা হচ্ছিল গোটা যুগোস্লাভিয়াজুড়ে। মূলত তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ায় কমিউনিজমের এ উত্থান ছিল ইউরোপজুড়ে ফ্যাসিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ।

কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রের ধার ধারে না, সেদিক থেকে এটি ফ্যাসিবাদ থেকে খুব একটা আলাদা নয়। বলা যায় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আলিয়ার ভাষায়— লাল স্বৈরাচারের উদ্ভব হলো কালো স্বৈরাচারকে প্রতিহত করতে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় একচ্ছত্র শাসনের অধীনে ভিন্ন আদর্শের প্রচার-প্রচারণা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। সে কারণে কমিউনিস্ট প্রচারণা চলত অত্যন্ত গোপনে। তারা প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রচারপত্র বিলি করত। আলিয়ার ক্লাসরুমে বিতরণকালে তার হাতেও এ রকম কিছু লিফলেট-হ্যান্ডবিল পৌঁছায়। সমাজতান্ত্রিক লেখাজোখা পড়ে তিনি উপলব্ধি করলেন, সমাজতন্ত্র মূলত সামাজিক অসাম্যের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করেছে, ধর্মকে দোষারোপ করেছে। যদি কেউ ধর্মকর্ম মেনে চলে, তাহলে সে সফল মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না—এটিই হলো সমাজতন্ত্রের দাবি।

কমিউনিস্টদের বইপত্র পড়ে এবং শিক্ষকদের নানা রকম কথায় আলিয়া বিশ্বাসের দোলাচলে ভুগতে থাকেন। এক-দুই বছর তিনি তার বিশ্বাসের জগতে অনেকটা দ্বিধাশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না, আসলে কোনটা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য; ইসলাম নাকি কমিউনিজম। কিন্তু যিনি পরবর্তী সময়ে বসনিয় মুসলিমদের জাতিসত্তা ও ধর্মীয় পরিচিতি রক্ষার

নিশানবরদার হবেন, তিনি কি করে ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের মরীচিকাময় ভঙ্গুর আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন? শত জল্পনা-কল্পনা ও দীর্ঘ দোদুল্যমানতা শেষে তিনি ইসলামের চিরন্তন, ন্যায়ভিত্তিক সত্য আদর্শকেই বুকে ধারণ করেছেন এবং আমরণ সে আদর্শকেই সযত্নে লালন করেছেন। আলিয়া বলেছেন—‘আমি সেটা (কমিউনিজমের যুক্তি) মেনে নিইনি। আমার কাছে মনে হয়েছে, ধর্মের মূল দাবি হচ্ছে জবাবদিহিতা। এ জবাবদিহিতা সকলের জন্য সমান, হোক সে রাজা বা সম্রাট; তাকেও জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এমনকি দুনিয়ার জীবনে যদি কারও পুলিশের ভয় না থাকে, কেউ যদি পুলিশকে যেকোনোভাবে কবজা করে ফেলতে পারে, ধর্ম বলেছে তাকেও পরকালে তার যেকোনো অন্যায়-অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া এ নিখিল বিশ্ব আমার কাছে অর্থহীন এক পৃথিবী।’^২

ইসলামকে যখন তিনি নতুন করে আঁকড়ে ধরলেন, তখন তিনি যেন নবজীবন লাভ করলেন। বিশ্বাসের দোলাচল ভেঙে চুরমার করে এক ভিন্ন আলিয়ায় পরিণত হলেন তিনি। কমিউনিজমের মিথ্যা ফানুস আর কমিউনিস্টদের বস্তাপচা যুক্তির বাণ তাকে বিদ্ধ করতে পারেনি। ইসলাম আর কমিউনিজমের দোলাচলে দুলতে থাকা আলিয়া যখন ইসলামকেই হৃদয়ে স্থায়ী আসন দিলেন, ইসলামের প্রতি তার দৃঢ়তা যেন আগের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। যে ইসলাম তিনি জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন, যে ধর্মবিশ্বাস তিনি মক্তবে শিখেছিলেন, আলিয়ার ধারণকৃত নতুন ইসলাম যেন তার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিশালী। আলিয়া বলেছেন—‘তারপর কখনো আর আমি সে বিশ্বাস হারাইনি।’^৩

^২ প্রাগুক্ত

^৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংগ্রাম, কারাভোগ ও বিয়ে

‘ইয়াং মুসলিম’ গঠন ও আলিয়া

‘ইয়াং মুসলিম’-কে বসনিয় ভাষায় বলা হয় Mladi Muslimani. Mladi, অর্থ—তরুণ, যুবক, প্রাণোচ্ছল ইত্যাদি। আলিয়া ইজেতবেগভিচের ইয়াং মুসলিম-এ যোগদানের প্রেক্ষাপট আলোচনার পূর্বে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। ১৮৭৮ সালে বসনিয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের বলয় থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই মুসলিমদের অবস্থা নাজুক হতে থাকে। ধর্মীয় সত্তা নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকাটাও হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। বসনিয়ার মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে যেতে থাকে। সার্ব ও ক্রোয়াটদের মধ্যে জাতিগত উগ্রবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, বসনিয়ায় সেকুলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের উত্থান ঘটতে থাকে, সেইসাথে ঐতিহ্যবাদী মুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এহেন অবস্থায় মুসলিমদের মধ্যে ধর্মচর্চা ও জাতিগত সত্তা সংরক্ষণের লক্ষ্যে কতিপয় তরুণ ইয়াং মুসলিম নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ইয়াং মুসলিম প্রকৃতিগত দিক থেকে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীও ছিল না, আবার গঠনগত দিক থেকে কোনো দলীয় শাখাও ছিল না; বরং এটি যুগোস্লাভিয়ার মুসলিম তরুণদের নৈতিক মানোন্নয়নের জন্যই কেবল গড়ে উঠেছিল। শুরুর দিকে ইয়াং মুসলিম মূলত একটি পাঠচক্র ছিল। কতিপয় কিশোর-তরুণ একসাথে বসে ইসলাম, মুসলিম, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি নিয়ে পরস্পর আলোচনা করত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসাদ, তারিক, এমিন ও হুসরেফ প্রমুখ।

পরবর্তী সময়ে আলিয়া ইজেতবেগভিচ, নাজিব এসরেফ নামক কয়েকজন পাঠচক্রে যুক্ত হন। ১৯৩১ সালের মার্চের শেষের দিকে সর্বপ্রথম তারা সম্মিলিত সভা আহ্বান করে, যেখানে সভাপতিত্ব করেন তারিক মুফতিচ নামের এক তরুণ। সভায় প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন উপস্থিত ছিল এবং তখনকার নিয়মানুযায়ী একজন পুলিশ সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের নাম রাখা Mlandi Muslimani বা Young Muslim. সংগঠনের নাম ‘ইয়াং মুসলিম’ কেন রাখা হলো, এটি নিয়ে কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

অধিক প্রসিদ্ধ একটি ব্যাখ্যা হলো—ওই সময়ে বসনিয়ার বেশ কয়েকজন মুসলিম স্কলার মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। তন্মধ্যে দুজন ছিলেন বেশ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। একজন হলেন মেহমেদ হানজিচ (১৯০৬-১৯৪৪) এবং অপরজন কাসিম দোবরাচা (মৃ. ১৯৭৯)। তারা দুজন আল-আজহারে পড়াকালীন সময়ে মিশরে ‘আল-শুব্বান আল-মুসলিমুন’ নামের একটি

তরুণদের সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারেন। ইয়াং মুসলিম এ দুজনের অভিজ্ঞতালব্ধ নাম তাদের সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।^৪ সমসময়ে অবশ্য ইয়াং তথা তরুণদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন : ইন্দোনেশিয়ায় ১৯২৫ সালে মুসলিম তরুণদের সংগঠন Young Muslim Association, পূর্বে উল্লিখিত মিশরে আল-শুব্বান আল মুসলিমুন ও মালয়েশিয়ায় ABIM ইত্যাদি। ইন্দোনেশিয়া ও মিশরের উভয় সংগঠনই রাজনীতি থেকে দূরে থাকত। তারা মূলত ধর্ম, সংস্কৃতি, খ্রিষ্টান মিশনারির সাথে সংলাপ (ডায়ালগ) এ জাতীয় কাজগুলো করত। বসনিয়ার ইয়াং মুসলিমের ধর্মীয়, শিক্ষাসংক্রান্ত এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদিকেই প্রাধান্য দেয়।

কিশোর আলিয়া সৌভাগ্যক্রমে সংগঠনটির সংস্পর্শে আসেন। আলিয়া এ সংগঠনটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো, তিনি তার নিজ পরিবার বা মজুবের শিক্ষকদের কাছে ইসলামের যে রূপ দেখেছেন এবং শিখেছেন, এখানে তার চেয়ে ভিন্নতর কিছু পেয়েছিলেন; যে রকমটি তিনি মনে মনে প্রত্যাশা করতেন। তিনি নিজের ভাষায় বলেছেন—‘ইমাম বা উলামাগণ (হোজা) সাধারণত রুটিনমাসিক ইবাদতসমূহ তথা ইসলামের বাহ্যিক রূপের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেন, কিন্তু রুহানি বা অভ্যন্তরীণ বিষয়কে এবং ইসলামের মূল সারবস্তুকে ততটা গুরুত্ব দেন না। ইয়াং মুসলিম ইবাদতের পাশাপাশি ব্যক্তির রুহানিচর্চার দিকটাকেও সম্যকভাবে প্রাধান্য দেয় এবং ইসলামের মূল বার্তাকে ধারণ করে।’^৫

এটি ইতিহাস স্বীকৃত যে, ইয়াং মুসলিম-এর উদ্যোক্তা কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীরা তৎকালীন সময়ে মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘প্যান-ইসলামিস্ট মুভমেন্ট’ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যার প্রবক্তা ছিলেন সাইয়েদ জামালুদ্দিন আফগানি এবং পরবর্তী সময়ে তার শিষ্য মিশরের মুহাম্মাদ আবদুহ এবং সিরিয়ার রশিদ রিদা এ আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখেন। পাকিস্তানের প্রখ্যাত কবি, মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রথিতযশা দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী ড. আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবালের ভাবাদর্শেও বহুলাংশে প্রভাবিত ও উৎসাহিত ছিল ইয়াং মুসলিম।^৬ ১৬ থেকে ২৬ বছর বয়সি সার্বিয়ার বেলগ্রেড ও ক্রোয়েশিয়ার জাগরেব বিশ্ববিদ্যালয়ের এ শিক্ষার্থীদের সাথে প্যান-ইসলামিস্ট আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকদের সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। বয়সে নবীন হলেও ইয়াং মুসলিম এর সুদূরপ্রসারী ভিশন পর্যালোচনা করলে একে নবীন বলার সুযোগ নেই। যে পরিকল্পনা ও চিন্তা বিশ্বমুসলিমের বুদ্ধিজীবী মহল থেকে আসা দরকার ছিল, সে চিন্তা উৎসারিত হয়েছে তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার কয়েকজন তারুণ্যোদ্দীপ্ত স্বপ্নবাজ তরুণদের মস্তিষ্ক থেকে। ইউরোপে, বিশেষভাবে যুগোস্লাভিয়ায় ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থান কী হবে, মুসলিম

^৪ Fikret Karčić, The Other European Muslims: A Bosnian Experience, CNS, Sarajevo, 2005, P. 203

^৫ Alija Izetbegović, Inescapable Questions: Autobiographical Notes, translated by Saba Rissaluddin and Jasmina Izetbegovic (Leicester: The Islamic Foundation, 2003), 17

^৬ ENES KARIĆ, Alija Izetbegović (1925—2003), Islamic Studies, Vol. 43, No. 1 (Spring 2004), P.184

জনগোষ্ঠীর মধ্যে কীভাবে একটি পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করা যায়, কীভাবে ইসলামি শিক্ষার প্রসার করা যায়, এ বিষয়গুলোই ছিল ইয়াং মুসলিম সংগঠনটির মূল প্রতিপাদ্য।

ইয়াং মুসলিম নামের এ সংগঠনটি যখন যাত্রা শুরু করে তখন মুসলিম বিশ্ব চরম দুঃসময় পার করছিল। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি মুসলিম দেশ তখন স্বাধীনতা লাভ করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আধিপত্যে যেভাবে মুসলিম বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছিল, তার সাথে ইয়াং মুসলিম-এর প্রাতঃকালীন সদস্যবৃন্দ মোটেও একমত ছিলেন না। তারা চিন্তা করেছিলেন, ইসলামের মূলনীতিকে ঠিক রেখে, সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে কীভাবে মুসলিম বিশ্বের উদ্ধৃত সংকট সমাধান করা যায়। ইয়াং মুসলিমের চিন্তা-পরিকল্পনা বসনিয়া বা যুগোস্লাভিয়ার সীমানা পেরিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের বৃহৎ বলয় স্পর্শ করেছিল। অর্থাৎ এটি পরিণত হয়েছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আদর্শিক প্রতিনিধিতে। এটি বললে অত্যুক্তি হবে না, ইয়াং মুসলিম-ই আলিয়া ইজেতবেগভিচের বিশ্বজনীন জ্ঞানতত্ত্বের বুনিয়াদ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে, যার প্রমাণ আমরা তার লেখালিখিতে পাই।

বসনিয়ার তৎকালীন উলামা শ্রেণির সাথে এই তরুণদের চিন্তার বিপুল মতপার্থক্য ছিল। প্রথমদিকে এটি সাংগঠনিক নমুনায় সুসংগঠিত কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না। অবশেষে বসনিয়ার ইমামদের তৎকালীন সংগঠন ‘আল-হিদায়া/El-Hidaje’ ইয়াং মুসলিম’-কে তাদের যুব বিভাগের মর্যাদা দেয়। এ স্বীকৃতি তাদের সাংগঠনিক ও আদর্শিকভাবে সুসংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কয়েক বছর পর ১৯৪৪ সালের দিকে এসে আলিয়া ইজেতবেগভিচ সংগঠনে বেশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। না, ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা পিছুটানের কারণে নয়, ইমাম সংস্থা আল হিদায়ার প্রবীণ উলামাদের সাথে মতপার্থক্যের কারণে। তার মতপার্থক্যের কারণ ছিল সুস্পষ্ট। তার মতানুযায়ী মুসলিম সমাজে এমন কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠী থাকতে পারে না, যারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অগ্রগতির অন্তরায়। আলিয়ার ভাষায়, তারা ‘হোজা’ হোক কিংবা ‘শাইখ’ হোক। আলিয়ার এ অগ্রসরমান মনোবৃত্তি স্পষ্টতই তথাকথিত ধর্মীয় ‘পুরোহিততন্ত্রের’ বিরোধী ছিল। বাস্তবিকপক্ষেই ইসলাম মধ্যযুগের খ্রিষ্টবাদের মতো সুনির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর অযাচিত ও অতিরিক্ত আধিপত্য স্বীকার করে না। ইসলাম অন্য কোনো ধর্মের মতো পুরোহিত বা পাদরিদের ব্যাখ্যানির্ভর কোনো ধর্ম নয়, যেখানে ধর্মীয় পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাই শেষ কথা; বরং ধর্মীয় উলামাদের ধর্মব্যাখ্যা যদি ইসলামের মূলনীতির সাথে কোনোভাবে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে উলামাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত হবে। অর্থাৎ কোনো গোষ্ঠী তাদের খেয়ালখুশিমতো ইসলামকে উপস্থাপন করার সুযোগ নেই।

১৯৪১ সালের মার্চ মাসে সংগঠনটিকে প্রথবারের মতো তৎকালীন প্রচলিত আইনের আওতায় নিবন্ধিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, জার্মানি এপ্রিল মাসে হঠাৎ যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় ইয়াং মুসলিমের সদস্যদের অস্তিত্ব রক্ষাই তখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তখন আর নিবন্ধন করা সম্ভব হয়নি। সুসংগঠিত কোনো সাংগঠনিক রূপ না থাকলেও সংগঠনটি ক্রমেই মুসলিম তরুণ-ছাত্রসমাজের নিকট বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। বসনিয়ার বাইরেও যুগোস্লাভিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম ছাত্রদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় সংগঠনটি। ১৯৪৫ সালে যুগোস্লাভিয়া সরকার কর্তৃক বসনিয় উলামাদের সংগঠন আল হিদাযাকে নিষিদ্ধ ও বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই আল হিদাযা-এর অঙ্গসংগঠন হিসেবে ইয়াং মুসলিমও তার স্বাভাবিক কার্যক্রমের বৈধতা হারায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট পার্টি তখন যুদ্ধপরবর্তী যুগোস্লাভিয়ার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে মরিয়া। মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে চেষ্টা করেছে সহজ উপায়ে ইয়াং মুসলিমের তৎপরতা বন্ধ করতে। সে লক্ষ্যে প্রথমে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু যে তরুণেরা পূর্ব ইউরোপের বলকানের এই ভূখণ্ড তথা পৃথিবীর গতিধারা পালটে দেওয়ার দৃষ্ট শপথ নিয়েছে, তারা তো এত সহজেই দমে যাওয়ার নয়! দুনিয়ার যেকোনো ভূখণ্ডে যেকোনো আদর্শিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। কোনো আদর্শিক তৎপরতার সম্মুখে বাধার হিমালয় দাঁড় করিয়ে দিলেও তাকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যায় না; বরং অধিক তীব্রতার সাথে লক্ষ্যপানে ধাবমান হয়। ইয়াং মুসলিমও তাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৪৭ সালের পর ইয়াং মুসলিম গোপনে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। গোপনীয়তার স্বার্থে তারা ছোটো ছোটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করত। এক গ্রুপ অপর গ্রুপের সদস্যদের চিনত না। গ্রুপ লিডারগণ গ্রুপসমূহের মধ্যে সমন্বয় করত। এ সময় তারা নিজেদের মূল নাম গোপন রেখে ছদ্মনাম ব্যবহার করত। কমিউনিস্ট সরকার অন্য কোনো উপায়ে ইয়াং মুসলিমের অগ্রযাত্রা থামাতে ব্যর্থ হয়ে গ্রেফতার-নির্যাতনের পথ বেছে নেয়।

সেনাবাহিনীতে যোগ না দিয়ে পলাতক আলিয়া

১৮ বছর বয়সে ১৯৪৩ সালে হাইস্কুল সমাপ্তির পর নিয়মানুযায়ী আলিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। বসনিয়া তথা যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক বাহিনীর নিয়মানুসারে তখন হাইস্কুল সমাপ্তির পর প্রতিটি নাগরিককে এক বছর সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হতো। দেশের নাগরিকদের আত্মরক্ষা, শত্রুর মোকাবিলা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল। এর ফলে প্রতিটি নাগরিকই এক একজন সৈনিক হিসেবে গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রের যেকোনো জরুরি নিরাপত্তাজনিত সংকট মুহূর্তে নাগরিকগণ প্রশিক্ষিত সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। আলিয়া হাইস্কুলের পাঠ শেষ করার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

টগবগে একজন তরুণ হিসেবে সেনাবাহিনীতে না দেওয়ায় তিনি সেনাবাহিনীর নজরে পড়ে যান। যুগোস্লাভ সেনাবাহিনী তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। ফলে সারিয়েভোতে অবস্থান করা ক্রমান্বয়ে তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর হাত থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য সারিয়েভো ত্যাগ করে তিনি তার জন্মস্থান শামাচে পালিয়ে যান।^৭ ভাগ্যক্রমে তিনি সফলভাবে

^৭ Zehrudin Isaković, Alija Izetbegović (1925-2003):Biography, Museum of Alija Izetbegović, (2005), P.7

সেনাবাহিনীর চোখ ফাঁকি দিতে সক্ষম হন। আলিয়া ইজেতবেগভিচ অস্ত্র হাতে তুলে নেননি এজন্য নয় যে, তিনি ভীত ছিলেন বা তার দৃঢ়তা ছিল না; বরং তিনি তার অসীম সাহসের পরিচয় তার জীবনের গোপুলিলগ্নে বসনিয়ার মুসলিমদের রক্ষার ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তখন ইতোমধ্যেই ইয়াং মুসলিম আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে চিন্তা ও কর্মের জগতে একটি নতুন বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেজন্য তিনি হয়তো সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাননি।

যুগোস্লাভিয়া গঠন

আমরা বাংলায় যেটিকে যুগোস্লাভিয়া বলি, ইংরেজিতে সেটি Yugoslavia (ইয়োগোস্লাভিয়া)। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় Yugo শব্দের অর্থ দক্ষিণের বা দক্ষিণাঞ্চলীয়, আর Slavia বলতে বোঝায় স্লাভ সম্প্রদায়কে। Yugoslavia অর্থ দাঁড়ায় ‘দক্ষিণাঞ্চলীয় স্লাভ সম্প্রদায়।’ বলকান অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ স্লাভ সম্প্রদায়ভুক্ত। আজকের বসনিয়াক মুসলিম, সার্ব অর্থোডক্স খ্রিষ্টান কিংবা ক্যাথলিক ক্রোয়াট সকলেই তাদের বংশমূলের দিক থেকে সাউথ স্লাভ। বসনিয়া তথা বলকানে অটোম্যানপরবর্তী আমলে হেবসবার্গ শাসন শেষে ১৯১৮ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের নাম রাখা হয় Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. কিং আলেকজান্ডার ১৯২৯ সালের ৬ জানুয়ারি সাম্রাজ্যের সংবিধান স্বগিত করে Kingdom of Yugoslavia নামে নতুনভাবে নামকরণ করেন।^৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সময়ে বিশ্বরাজনীতিতে আলোচিত এ যুগোস্লাভিয়া মূলত বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই গঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একপর্যায়ে জার্মানি ও ইতালি যুগোস্লাভিয়া দখল করেছিল, কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলে অক্ষশক্তি পরাজিত হলে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুগোস্লাভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। টিটো ক্ষমতায় বসেই ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি যুগোস্লাভিয়াকে ফেডারেশন হিসেবে ঘোষণা করে। অর্থাৎ বসনিয়া, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া এবং মেসিডোনিয়া এই ছয়টি ফেডারেল অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল ‘যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশন।’

আলিয়ার প্রথম কারাবরণ

যুদ্ধ শেষ হলো। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই শেষ হলো না; বরং যুদ্ধের সমাপ্তির সাথে সাথে যুগোস্লাভিয়ায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় শাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো কমিউনিস্ট নেতা জোসেফ মার্শাল টিটো। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টি সারায়েভোতে প্রবেশ করে এবং ১৯৯০ পর্যন্ত টানা ৪৫ বছর শাসন করে। ইয়াং মুসলিম ছাড়াও Preporod নামে যুগোস্লাভিয়ার মুসলিম কমিউনিটির তখন আরেকটি সংগঠন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি নানাভাবে সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চেষ্টা করে। একই বছরের শীতের শেষে বসন্তের দিকে ইয়াং মুসলিমের প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় আলিয়া ইজেতবেগভিচসহ ইয়াং মুসলিমের তরুণ নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে

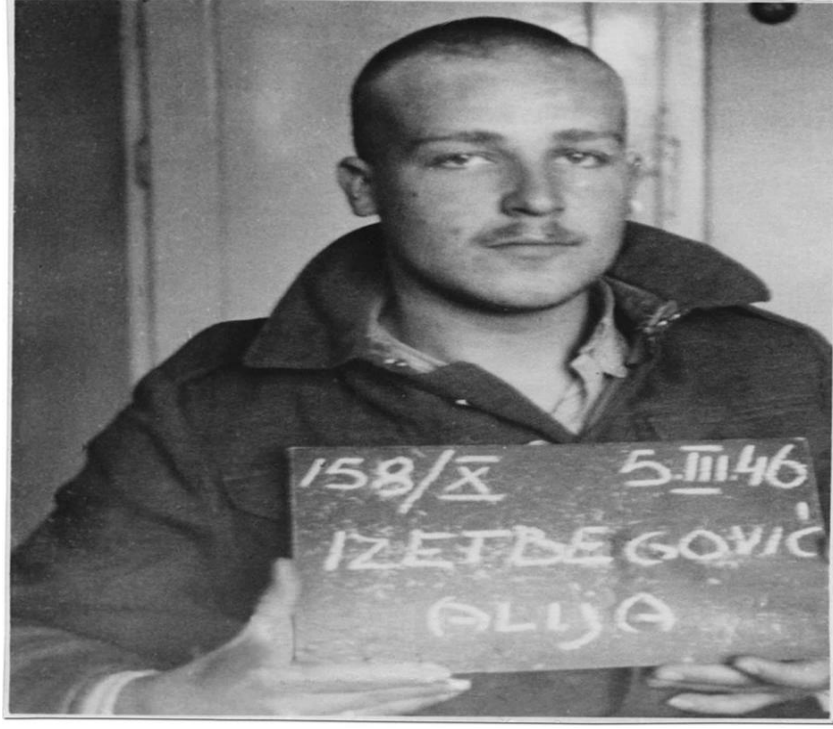
^৮ Leslie Benson, *Yugoslavia : A Concise History*, Palgrave, 2001, P.XV

জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। সভায় উপস্থিত লোকজন মুহূর্মুহ করতালির মাধ্যমে সেদিন ইয়াং মুসলিমকে উৎসাহিত করেছিল। এদিকে হঠাৎ সভাস্থলে পুলিশ এসে আলিয়াসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। সৌভাগ্যক্রমে, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরের দিন তাদের সবাইকে থানা থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয়, কারাগার পর্যন্ত আর যেতে হয়নি। এবারের মতো কারাভোগ থেকে রেহাই পেল ইয়াং মুসলিম নেতৃবৃন্দ। মুক্তি পাওয়ার পর নতুন উদ্যমে তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করল। প্রথমবার থানা থেকে ছাড়া পেলেও কয়েক মাসের ব্যবধানে ১৯৪৬ সালে পুনরায় গ্রেফতার করা হলো আলিয়া ইজেতবেগভিচসহ প্রথম সারির ১৪ জন ইয়াং মুসলিম নেতাকে।

আলিয়ার গ্রেফতারের ঘটনা ছিল এ রকম—আলিয়ার বয়স তখন মাত্র কুড়ি বছর। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে কমিউনিস্ট পতাকাতলে শামিল করে যুগোস্লাভিয়াকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল ক্ষমতাসীনরা। সে লক্ষ্যে যুগোস্লাভিয়ার তরুণদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টি ‘রেনেসাঁ/renaissance’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল। প্রতিষ্ঠার পরপরই তারা সারায়েভো শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ‘সারায়েভো ন্যাশনাল লাইব্রেরি’তে একটি জনসভা আহ্বান করল। আলিয়া সভায় যোগদান করলেন। সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি সভা শুরু হলো। সভার একপর্যায়ে আলিয়া মঞ্চে উঠে কমিউনিস্টবিরোধী বক্তৃতা দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত সভায় কমিউনিস্টবিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার পরিণাম কী হতে পারে, সেটি সহজেই অনুমেয়। তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হলো। দিনটি ছিল ১ মার্চ, ১৯৪৬। বাড়ি ফিরলে অমন পরিবেশে গিয়ে প্রতিবাদী বক্তৃতা দেওয়ার কারণে আলিয়ার মা তাকে বেশ বকাঝকা করলেন।

আলিয়ার বোন বলেছেন—‘সে রাতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, না জানি পরবর্তী সময়ে আরও ভয়াবহ কী ঘটে। ভয়ে আমরা আলিয়ার বইপত্র, লেখালিখির কাগজপত্র সব লুকিয়ে ফেললাম। গভীর রাতে হঠাৎ কলিংবেল বেঁজে উঠল, সেইসাথে দরজায় আঘাতও করা হচ্ছে। দরজা খুলে দেওয়া হলো। একদল পুলিশ ঘরে প্রবেশ করেই ত্রুন্ধস্বরে বলল—আলিয়া কোথায়? আমরা জবাব দিলাম—ও বাসায়ই আছে। পুলিশেরা বলল—আলিয়াকে আমাদের সাথে যেতে হবে এবং ওকে জেলখানায় নেওয়া হবে। গ্রেফতার করা হলো আলিয়াকে।’^৯ প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হলো, আলিয়াকে দেওয়া হলো তিন বছরের কারাদণ্ড। মাত্র ১৫-২৫ বছরের কিশোর-তরুণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো যুগোস্লাভিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা ও মৌলবাদ (Fundamentalism) প্রচার করা। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল যুগোস্লাভিয়ার তরুণ ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ-মৌলবাদের অভিযোগ আনা হয়নি; বরং দুনিয়ার যেখানেই ইসলামি শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেখানেই সংশ্লিষ্টদের এ তকমা দেওয়া হয়েছে। শত বাধাবিপত্তি, গ্রেফতার অত্যাচার সত্ত্বেও ইয়াং মুসলিমের অগ্রযাত্রা কিছুতেই ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না। দিনদিন বেড়েই চলছিল তাদের বিস্তৃতি। চারজনকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড।

^৯ আলজাজিরা-কে দেওয়া আলীয়া ইজেতবেগভিচের বোন হায়রিয়া-এর সাক্ষাৎকার, Bosnian Leader Alija Izetbegovic: From Prisoner to President (Part 1)



গ্রেফতারের পর কারাগারে কিশোর আলিয়া

তন্মধ্যে হাসান বিবার নামের একজনের বয়স ছিল ২৭। হাসানই সবার মধ্যে বড়ো। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিল নুসরেত নামের এক কিশোর, যার বয়স ২০ বছরও হয়নি তখন। নুসরেতের পরিবারের পক্ষ থেকে বয়সের বিবেচনায় তার জন্য আপিল করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম ঘটনার সাক্ষী হয়ে রবে এটি যে, কিশোর নুসরেতকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি। এতটুকু বয়সের একজন কিশোর যুগোস্লাভিয়ার মতো বৃহৎ ও শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের জন্য কী এমন বড়ো হুমকি হয়ে উঠত! অন্তত বয়সের বিবেচনায়ও কিশোর নুসরেতের সাজা লঘু করা যেত। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কাছে বয়স কম কিংবা বেশি কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। যে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন কারাগারে কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধদেরও কারাভোগ এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে দেখা যায়। নুসরেতের জন্য করা তার পরিবারের আপিল আমলে নেওয়া হলো না, রেহাই দেওয়া হলো না কিশোর নুসরেতকে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, যে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রলয়ংকরী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত, অস্ট্রীয় প্রিন্স ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ডকে তার গর্ভবতী স্ত্রীসহ হত্যাকারী সে সার্ব তরুণ গার্ভিলো প্রিন্সিপের মৃত্যুদণ্ড হয়নি শুধু তার বয়সের স্বল্পতার কারণে। শত শত মানুষের সামনে প্রথমে যুবরাজ এবং তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রীকে হত্যা করেছিল গার্ভিলো। কিন্তু যে স্বল্প বয়স্ক কিশোরের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ প্রমাণিত নয়, তাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

জোসেফ টিটোর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক যুগোস্লাভিয়া তখন স্বাভাবিকভাবেই জোসেফ স্টালিনের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ মিত্র। রাজনৈতিক নীতিমালাসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিধিমালাতেও যুগোস্লাভিয়া সোভিয়েতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। টিটো এবং স্টালিনের মধ্যে অনেকটা রাজনৈতিক বড়ো ভাই-ছোটো ভাই সম্পর্ক। ইয়াং মুসলিমের উত্তরোত্তর অগ্রগতি দেখে

স্টালিন টিটোর বিরুদ্ধে ইসলামি মৌলবাদ প্রতিহতকরণে ব্যর্থতার অভিযোগ তোলে। ফলে পরের বছর ১৯৪৭ সালে ইয়াং মুসলিমের আরও কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করে পূর্বের গ্রেফতারকৃতদের মতোই সাজা দেওয়া হয়। বসনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় এক হাজার তরুণ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে ‘ইয়াং মুসলিম’কে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুগোস্লাভিয়ার দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং একপর্যায়ে চরম শত্রুতায় রূপ নেয়। সে কারণে একদিকে যেমন ইয়াং মুসলিমের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির যে অংশ স্টালিনপন্থি সংস্কারবাদী, তাদেরও অত্যাচার করা হচ্ছে। সংস্কারপন্থি কমিউনিস্টদের পরিচিতি বোঝাতে তখন কমিনফরমিস্ট (Cominformist) পরিভাষা ব্যবহৃত হতো। ইয়াং মুসলিম নেতা-কর্মীদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে, অপরপক্ষে সংস্কারপন্থি কমিউনিস্টদের মগজ ধোলাই (Brain-Wash) করে সংস্কারপন্থা থেকে ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তার এ তিন বছরের কারাভোগ সম্পর্কে আলিয়া বলেছেন—‘আমার জীবনে পরবর্তী সময়ে যা ঘটেছে, তার তুলনায় এটি তেমন কিছুই নয়। তবে ৬০/৭০ বছরের জীবনে এক হাজার দিন আর এক হাজার রাত, খুব কমও নয়।’

কারাগারের স্মৃতিময় দিনগুলো

গ্রেফতারের পর সামরিক আদালত কর্তৃক রায়ে পর তিন বছরের সাজা ভোগ করার জন্য আলিয়াকে প্রথমে পাঠানো হয় বসনিয়ার জেনিচা অঞ্চলের জেলখানায়। কারণবশত সেখানে তাকে খুব বেশি দিন রাখা হয়নি। মাত্র দুই মাস পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্টোলাচ এলাকায়। সাত মাস স্টোলাচের কারাগারে কাটান আলিয়া। কারাজীবনের এ পর্যায়ে এসে আলিয়া অন্যরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। যেহেতু তার সশ্রম কারাদণ্ড ছিল, আলিয়াকে কনিচ শহরের বিখ্যাত বোরাচকো লেকের পাশে একটি ভবন নির্মাণ প্রকল্পে পাঠানো হয় নির্মাণকাজ করার জন্য। সেটি ছিল যুগোস্লাভিয়ার সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর অফিস, যেটি মূলত ছিল ‘সিক্রেট পুলিশ’। দেশজুড়ে যে পুলিশ আলিয়াসহ ইয়াং মুসলিম নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন পরিচালনা করছে, আলিয়াকে দিয়ে সেই পুলিশ বাহিনীর দপ্তর বানানো হচ্ছে, কী অদ্ভুত! এখানেই শেষ নয়। আলিয়াকে নিয়ে যাওয়া হলো সারায়েভো শহরে। সেখানে আরেক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন আলিয়া। কমিউনিস্ট পার্টির হেডকোয়ার্টার নির্মাণের কাজে নিয়োজিত করা হলো আলিয়াকে।

ভাবা যায়? যে ইসলামবিদ্বেষী কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে আলিয়া প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। যে কমিউনিস্ট অত্যাচারী শাসনের জাঁতাকল থেকে জাতিকে মুক্ত করার দৃষ্ট শপথে পথ চলছেন আলিয়া। যাদের একনায়কতন্ত্র থেকে মানুষ মুক্তির প্রহর গুনছে। যে দলের আদর্শের বিরুদ্ধে আলিয়া তার মেধা, মনন চিন্তাশক্তি সবকিছুকে অকাতরে বিনিয়োগ করে চলেছেন, সেই পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে স্বয়ং আলিয়া। নিজ হাতে বিল্ডিং তৈরির উপাদানগুলো বহন করতেন আলিয়া। ইসলামকে দুনিয়ার সেরা আদর্শরূপে প্রমাণের জন্য যে

হাতেকলম তুলে নিয়েছেন, সেই হাত দিয়ে বহন করছেন ইসলামবিরোধী আদর্শের আতুরঘর তৈরির ইট, বালু, সিমেন্ট। জানি না, বিল্ডিং তৈরির প্রতিটি ইট, কংক্রিট প্লাস্টার বহন করতে আলিয়ার কেমন লেগেছিল। আলিয়া মনে মনে কী ভেবেছিলেন সেটাও আমাদের অজানা। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম সত্য হলো, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস নির্মাণে এ মহান সংগ্রামীর হাত ব্যবহৃত হয়েছিল।

সাজা ভোগের মেয়াদ দুই বছর পেরিয়ে তিন বছরে পড়েছে। আলিয়াকে পুনরায় বদলি করা হলো। এবার তাকে পাঠানো হলো সীমান্তবর্তী একটি ক্যাম্প। ক্যাম্পটি সারায়েভো থেকে প্রায় চার শ কিলোমিটার দূরে। সম্ভবত পরিবারের সদস্যদের থেকে অনেক দূরে স্থানান্তর করে আলিয়াকে মানসিক কষ্ট দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আলিয়ার জন্য এটি ছিল অধিক সুবিধাজনক জায়গা। বেশ প্রশস্ত একটি ফার্ম ছিল এটি। প্রচুর ফলমূল, আলুসহ অন্যান্য সবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, যেগুলো বন্দিরা তাদের ইচ্ছেমতো খেতে পারত। সীমান্তবর্তী ফার্মটিতে আলিয়ার কাজ ছিল কাঠ কাটা। এক মিটার সমপরিমাণ ছোটো ছোটো করে কাঠগুলোকে কাটতে হতো। শীতকালে ঘর গরম করার জন্য বসনিয়ার বিভিন্ন পরিবারে বিশেষ উপায়ে ঘরের মধ্যে এই কাঠ জ্বালানো হয়। জ্বালানো কাঠের ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য ঘরের ওপরে ইট ভাঁটার লম্বা খাম্বার মতো বিশেষ একপ্রকার খাম্বার মতো সরু পাইপ থাকে। বসনিয়ার তুলনামূলক অসচ্ছল এমনকি অনেক সচ্ছল পরিবারও ইলেকট্রিক হিটারের পরিবর্তে খরচ কমাতে শীত নিবারণের জন্য এই কাঠ ব্যবহার করে। আলিয়া কারাগারে সে কাঠগুলোই কাটতেন। প্রতিদিন কারা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঠ কাটার সংখ্যা নির্ধারণ করে দিত এবং বন্দিদের প্রত্যেককে তাদের প্রতিদিনের কোটা পূরণ করতে হতো। কাজ শেষে কাঠ জ্বালিয়ে বন্দিদের সাথে একসাথে আলু পুড়িয়ে খেতেন আলিয়া। এভাবে কারাজীবনের শেষ ছয় মাস বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটান তিনি।

আলিয়া তখন ২৪ বছরের তাগড়া তেজোদ্দীপ্ত নওজোয়ান। শরীরে যেমন উদ্দাম শক্তি মনেও তেমনি পাহাড়সম দৃঢ়তা। কারাগার থেকে কারাগারে বারবার বদলি এবং শারীরিক পরিশ্রম তার মনোবল এতটুকুও স্তিমিত করতে পারেনি। পরিবারের সদস্যগণ দেখা করতে এলে তাকে সুস্থ ও সুঠাম দেখে তারা খুশিই হতেন। কাঠ কাটাকে তিনি এত বেশি উপভোগ করতেন যে, পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন—যদি রোজগারের জন্য পেশা হিসেবে তাকে কোনো কায়িক পরিশ্রম করতে হতো, তিনি কাঠ কাটা তথা কাঠুরিয়ার কাজকেই বেছে নিতেন। তিন বছরের বৈচিত্র্যময় কারাভোগ শেষে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে কারামুক্ত হন আলিয়া ইজেতবেগভিচ।

কারামুক্তির পর আলিয়া ইয়াং মুসলিমের নেতৃস্থানীয় সদস্য হাসান বিবারের মাধ্যমে পুনরায় সংগঠনে যোগদান করলেন। যেহেতু সবেমাত্র তিন বছরের কারাভোগ শেষে মুক্ত হয়েছেন আলিয়া, সেজন্য যোগদানের পরপরই তাকে খুব বেশি কাজ দেওয়া হতো না। হাসান বিবার তাকে বরং কিছু লেখালিখি করতে বললেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তখন ‘মুজাহিদ’ নামে একটি পত্রিকা বের করা হতো। প্রশাসনের ভয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে পত্রিকা প্রকাশ করে গোপনে সেগুলো বিলি করা হতো। দুঃখজনকভাবে, হাসান বিবারকে একই বছরের জুলাই মাসে গ্রেফতার করে অক্টোবরে গুলি করে হত্যা করা হয়।

আলিয়া ইজেতবেগভিচের বিয়ে

আলিয়া তখন ১৮ বছরের প্রাণচঞ্চল তরুণ। হালিদা নামের এক অপরূপ রূপবতী কিশোরী আলিয়াদের একই স্ট্রিটে থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোতে হালিদার সাথে একদিন আলিয়ার পরিচয় ঘটে। সেই থেকে দুজনের চেনাজানা। মাঝে মাঝে তারা দেখাও করতেন। আলিয়া ইজেতবেগভিচের জীবনের রোমাঞ্চকর এ অধ্যায়ের টুকরো গল্প আলিয়ার নিজের ভাষায়ই শোনা যাক। আলিয়া তার স্মৃতিকথায় বলেছেন—‘আমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করি, তাকে আমি আমার ১৮ বছর বয়স থেকে চিনি। হালিদা নামের মেয়েটি ছিল পরমাসুন্দরী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওই সময়গুলোতে যখনই যুদ্ধবিমানগুলো সাইরেন বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করত, আমরা দুজন তখনই বাইরে বের হতাম। কখনো কখনো এ রকমটি দিনে কয়েকবারও হতো। কারণ, ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানগুলো ইতালির ঘাঁটি থেকে হাঙ্গেরিতে তাদের টার্গেটকৃত স্থানে বোমা ফেলতে সারিয়েভো শহরের ওপর দিয়েই যেত।

বিমান থেকে বোমা ফেলা হয় কি না, এই ভয়ে মানুষেরা যখন পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজত, তখনও আমি আর হালিদা বাইরেই থাকতাম। সেই ভয়ংকর সময়েও আমরা কোনো পাথর কিংবা বেধে নির্ভয়ে বসে থাকতাম এই সাহসে যে, আমাদের অন্তত কিছুই হবে না। নিঃসন্দেহে শহরে কেবল আমরা দুজনই ব্যতিক্রম ছিলাম—যারা যুদ্ধবিমানের সাইরেন শুনে আনন্দ পেতাম। যখন আমি প্রথমবারের মতো তিন বছরের কারাভোগ করছিলাম, তখন আমরা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। সে চিঠিগুলো ভালোবাসাবিষয়ক শব্দের চেয়ে আবেগাপ্লুত অনুভূতিতে ভরা, গুরুগম্ভীর শব্দাবলিতে ঠাসা ছিল। আসলে মানুষ সাধারণত ভালোবাসা শব্দটিকে হালকাভাবে দায়িত্বহীনতার সাথে ব্যবহার করে। আমার মনে হয়, কারাগারের যে সেন্সর কর্মকর্তাগণ আমাদের চিঠিগুলোকে পড়ত, তারা আমাদের চিঠিগুলোর নান্দনিক শব্দের ব্যবহার দেখে সম্ভবত বেশ পুলকিত হতো। আমাদের বিচ্ছেদ-বিরহের কারণে যে অনুভূতিগুলো তীব্রতর হচ্ছিল, সেগুলোকে আমরা একপ্রকার মুক্ত লাগাম পরিয়ে রাখতাম।’^{১০}

একে তো রূপবতী, তদুপরি গুণেরও কমতি নেই হালিদার। সংসারের সকল কাজের করিতকর্মা, তার ওপর দর্জির কাজও জানে। একেবারে সোণায় সোহাগা। বিয়ের দিন কনেপক্ষের মহিলারা আলিয়ার বাড়িতে গেল প্রথানুযায়ী নবদম্পতিকে দুআ করতে। নববধূ হালিদা গোলাপি রঙের চমৎকার একটি রেশমি পোশাকে আচ্ছাদিত। পোশাকটি হালিদাকে উপহার দিয়েছে আলিয়ার ভগ্নিপতি। বোন হায়রিয়ার স্বামী নামকরা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে ভগ্নিপতিকে দামি রেশমি কাপড় খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। নববধূ হালিদা নিজে দর্জির কাজে দক্ষ হওয়ায় মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজ বিয়ের পোশাক নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছে। বিয়ের ঐতিহ্যগত রীতি অনুসারে নববধূকে কুরআন উপহার দেওয়া হলো। কারামুক্তির পর ১৯৪৯ সালে ২৪ বছর বয়সে আলিয়া ইজেতবেগভিচ আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে হালিদার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

^{১০} Alija Izetbegović, *Inescapable Questions: Autobiographical Notes*, translated by Saba Rissaluddin and Jasmina Izetbegovic (Leicester: The Islamic Foundation, 2003), পৃ. 21



নববিবাহিত আলিয়া-হালিদা দম্পতি

আলিয়ার চাকরি

আলিয়া তার হাইস্কুল ডিপ্লোমা দিয়ে একটি চাকরি পেয়েছিলেন। তার কর্মস্থল ছিল বর্তমানের স্বাধীন মন্টেনিগ্রোতে। বসনিয়া থেকে মন্টেনিগ্রোর দূরত্ব বেশি নয়। পূর্বে এটি সার্বিয়ার সাথে একীভূত ছিল, তখন দুটোর সম্মিলিত নাম ছিল সার্বিয়া অ্যান্ড মন্টেনিগ্রো। সেখানে আলিয়া একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে চাকরি করতেন। উক্ত কোম্পানিতে দশ বছরের চাকরি জীবনে সাত বছরই কাটিয়েছেন মন্টেনিগ্রোতে। কোম্পানির Perucica Hydro-Electricity Generating Plant নামের একটি বৃহৎ প্রজেক্টের প্রধান ছিলেন তিনি। তার সফল ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনায় প্রায় চার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্যানেল নির্মাণ করা হয় নদী থেকে পানি সরবরাহের জন্য। মন্টেনিগ্রোতে চাকরিরত অবস্থায় আলিয়ার পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে বড়ো মেয়ে লায়লা আকশামিয়া বলেছেন—‘সেখানে আমরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলাম। আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, তার আশেপাশে প্রচুর বিষাক্ত সাপ ছিল। সেজন্য যদিও মাঝে মাঝে ভয়ে থাকতাম। বাবা সাধারণত রাতে দেরি করে বাসায় ফিরতেন। কর্মস্থল থেকে কাদা মাখা হাত-পায়ে ক্লান্ত অবস্থায় ফিরতেন তিনি। তার ব্যস্ততার কারণে আমরা খুব কম সময়ই তার সাথে মিশতে পারতাম। কিন্তু ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাদের তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেননি; যতটুকু সম্ভব আমাদের সময় দিয়েছেন। যতটুকু সময় বাবার সাথে আমরা কথা বলার সুযোগ পেতাম, তার কথার মাধ্যমে আমাদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ফুটে উঠত।’^{১১}

পরপর দুজন মেয়ের পর আলিয়া একটি ছেলে সন্তান কামনা করছিলেন। অবশেষে ছেলে বাকির জন্মগ্রহণ করলে আলিয়া-হালিদা দম্পতি বেশ খুশি হন। তিনি চাকরিও করেছেন আবার একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনাও চালিয়ে গেছেন। শুধু চাকরি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা নয়, ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব নিয়ে তার গভীর চিন্তাধারার আলোকে বিস্তর লেখালিখিও করেছেন।

^{১১} আলজাজিরা-কে দেওয়া আলীয়া ইজেতবেগভিচের বড়ো মেয়ে প্রফেসর লায়লা আকশামিয়ার সাক্ষাৎকার, Bosnian Leader Alija Izetbegovic: From Prisoner to President (Part 1)

এদিকে সারায়েভো শহরে একটি কোম্পানির আইনি পরামর্শক (Legal Consultant) হিসেবে চাকরি পেলে মন্টেনিগ্রো থেকে সারায়েভো চলে আসেন। সারায়েভোতে এসেও তিনি চাকরির পাশাপাশি লেখালিখি চালিয়ে যেতে থাকেন। যেহেতু তিনি যুগোস্লাভিয়ায় বেশ পরিচিত মুখ এবং ইতোমধ্যেই একবার কারাভোগ করেছেন, সেহেতু তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি এড়াতে নিজ নামে না লিখে ছদ্মনামে লিখতেন। তিনি মূলত LSB ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। আলিয়া তার এ ছদ্মনামের ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে দিয়েছেন এবং এ তিনটি ইংরেজি বর্ণ ছিল তার তিন সন্তান লায়লা, সাবিনা ও বাকিরের নামের আদ্যাক্ষর।